রামানুজন : গণিতবিদদের গণিতবিদ

ভারতীয় এক ব্রাহ্মণ কিশোর, যিনি গণিতের ব্যাপারে এতোটাই আগ্রহী ছিলেন যে, খাটের নিচে বসে গণিত চর্চা করতেন অভিভাবকের বকুনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য। যক্ষা রোগে ভুগে তিনি মারা গিয়েছেন মাত্র ৩৩ বছর বয়েসে। তিনি শ্রীনিবাসন রামানুজন আয়েংগার। সাধারণ মানুষ রামানুজনের নাম জানে না ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি গণিতবিদ রামানুজনের নাম শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। তাকে বলা হয় গণিতবিদদের গণিতবিদ।

রামানুজনের জন্ম ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর মদ্রাজের তাঞ্জের জেলার কুম্বকোনামের কাছে কাবেরী ও ভবানী নদীর তীরে অবস্থিত এরোদ নামক এক গ্রামে। তার বাবার নাম শ্রীনিবাস ও মায়ের নাম কমলাতমাল।

৭/৮ বছর বয়সে কুম্বকোনাম হাই স্কুলে তিনি ভর্তি হন। ১০ বছর বয়সের মধ্যে তার প্রতিভার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১২/১৩ বছর বয়সে কিউরিক সমীকরণের সমাধান শিখে ফেলেন। সেই সময় নিকটবর্তী কলেজের ছাত্ররা গণিতে রামানুজনের দক্ষতার কথা জানতে পেরে তার সঙ্গে আলাপ করতে আসত। তিনি ত্রিকোণমিতিক ফাংশানগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত হিসেবে নয় বরং অসীম ধারার সমষ্টি হিসেবে।

১২/১৩ বছর বয়েসে ত্রিকোণমিতির অয়লারের সাইন ও কোসাইনের উপপাদ্য আবিষ্কার করেছিলেন। পরে তিনি লোনীর ত্রিকোণমিতি পড়ে জানতে পারেন যে উপপাদ্যটি তার আগেই গণিতবিদদের জানা ছিল। ফলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। ছোটকালেই তিনি অঙ্ক কষে বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছিলেন। স্কুলের শিক্ষকরা তার মেধা দেখে তাকে রুটিন তৈরির কাজ দিতেন। ১৬ বছর বয়সে জর্জফার নামক কেমব্রিজের এক ছাত্রের লেখা সিনোপসিস বইটি পড়েন। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। এটি যে গণিত নিয়ে লেখা কোনো উঁচুমানের বই তা নয়। কিন্তু রামানুজনের নামের সাথে জড়িত হয়ে এটি সর্বকালের বিখ্যাত বইয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। বইটিতে ৬১৬৫টি উপপাদ্য অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ছিল এবং উপপাদ্যগুলোর প্রমাণ তেমন বিস্তৃতভাবে দেয়া ছিল না। কিন্তু রামানুজনের মতো অসাধারণ প্রতিভার কিশোরের কাছে এ বইটি হয়ে দাঁড়ালো প্রেরণার উৎস। তার জীবনীকার লিখেছিলেন যে, 'এভাবে তার সামনে যে নতুন জগৎ উন্মোচিত হলো সেখানে তিনি আনন্দের সাথে বিচরণ করতে শুরু করলেন।'

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯০৭ সালে এফ এ পরীক্ষায় প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেন এবং বিশ্বের মহান বিজ্ঞানীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথারীতি ফেল করেন। অথচ রামানুজনের গাণিতিক প্রতিভা অনেকেরই জানা ছিল, তারপরও বুঝল না যে সবাই একরকম হয় না। আসলে ব্রিটিশদের হাতে তৈরি আর তার সঙ্গে আমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার মিশেলে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যা শুধুই দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসনিক কাজের কেরাণি তৈরি করতে পারে। জ্ঞানের পরিমাপ না করে পরীক্ষায় কে কত নাম্বার পেল তাই নিয়েই মগ্ন থাকে এ শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থা রামানুজনের মতো ধ্যানমগ্ন মানুষকে বুঝবে কেমন করে?

১৯০৯ সালে জানকী নামক ১০ বছর বয়সী একটি মেয়ের সাথে তার বাবা-মা বিয়ে দেন। ১৯১১ সালে রামানুজনের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তার অসাধারণ প্রতিভা সকলের চোখে পড়তে শুরু করে। গণিতে তার সাফল্যের কথা জানতে পেরে স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং এবং গিলবার্ট ওয়াকার তার জন্য বার্ষিক ৬০ পাউন্ডের একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। যেহেতু ভারতে তখন রামানুজনের মতো গণিতবিদের কাজের মূল্যায়নের জন্য যোগ্য কেউ ছিলেন না, তাই তার বন্ধুরা তাকে ইংল্যান্ডে তার কাজ পাঠানোর জন্য অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞের কাছে তিনবার চিঠি দিয়েও আশাব্যঞ্জক কোনো সাড়া তিনি পাননি। তারপর, ১৯১৩ সালের ১৬ জানুয়ারি কেমব্রিজের অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডিকে সেই সুবিখ্যাত চিঠিটি লেখেন যা তার জীবনকে পাল্টে দেয়। হার্ডি ছিলেন সমকালীন প্রথমসারির গণিতবিদ, সমকালীন গণিতজ্ঞদের তুলনায় তরুন। হার্ডিকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, I have not trodden through the conventional regular course in a University but I am striking out a new path for myself' অর্থাৎ 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মিত কোর্সের মধ্য দিয়ে পথ চলিনি কিন্তু আমি আমার নিজের জন্য বের করেছি একটি পথ।' চিঠিতে তিনি তার ১২০ টি গাণিতিক সূত্র লিখে পাঠান। যেহেতু চিঠিটির লেখক একজন ভারতীয় কর্মচারী এবং হার্ডি প্রায়ই বাতিকগ্রস্থ লোকদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়ে থাকেন যে, তারা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করেছেন, সেহেতু তিনি এ চিঠিকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। বেশিরভাগ সূত্রই তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল, যার কয়েকটি আবার পূর্ব থেকেই জানা। তারপরও তিনি সারাদিন ভাবতে থাকলেন, আসলেই কি সূত্রগুলো অর্থহীন? ঐদিন সন্ধ্যায় কেমব্রিজের আরেকজন প্রতিভাধর গণিতবিদ ই.লিটলউডকে তিনি ডেকে পাঠান এবং রামানুজনের উপপাদ্যগুলো বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। মাঝরাতের দিকে তারা বুঝতে পারলেন যে এসব আপাতঅর্থহীন উপপাদ্যগুলো আসলেই অর্থহীন নয় এবং এসব উপপাদ্যের পিছনে রয়েছে অসাধারণ কোনো প্রতিভার ছোঁয়া। হার্ডি পরে বলেছিলেন, ঐ সমস্ত উদ্ভট ও খামখেয়ালিপূর্ণ উপপাদ্য আবিষ্কারের ধারণা কোনো গণিতজ্ঞের মাথায় আসবে না। ১৯১৩ সালের ১৪ মার্চ হার্ডি ও নেভিল অনেক সমস্যা পার করে তাকে কেমব্রিজে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। কারণ, প্রথমাবস্থায় তার মা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সমুদ্রযাত্রা করতে বাধা দেন।

কেমব্রিজে এসে অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি তিন বছর কাজ করেন। এ সময় তার গণিতপ্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। প্রায়শই তিনি হার্ডিকে দিনে ১০/১২টি করে নতুন সূত্র আবিষ্কার করে দেখাতেন। তাঁর বেশিরভাগ কাজই হয়েছিল কেমব্রিজে থাকা অবস্থায়। কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্ভেদ্য মৌলিকতা ও স্বকীয়তা। প্রচলিত অর্থে গণিতবিদ তিনি হয়তো কখনই হতে পারেননি। তরুন বয়সে যদি তাকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হতো তাহলে যে তিনি আরও কত বড় গণিতবিদ হতে পারতেন তা আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি। তিনি ছিলেন তার সময়ের গণিতের চেয়ে অনেক এগিয়ে কিন্তু তার কাজ ভারতবর্ষের কেউ বুঝতে পারতো না। উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার অন্যতম নিদর্শন তিনি। ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থায় তার অতিথিদের তিনি মজার মজার সহজ গাণিতিক ধা-ধা দিতেন।

১৯১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এর কয়েকমাস পরেই তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। রামানুজনের অধিকাংশ কাজ ছিল সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে। সংখ্যার ধর্ম যে তিনি এতো চমৎকারভাবে মনে রাখতে পারতেন তার একটি সুন্দর বর্ণনা হার্ডি দিয়েছিলেন, 'তিনি যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন তখন তাকে আমি দেখতে যাই। আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমি যে ট্যাক্সিতে করে এসেছি তার নম্বর ১৭২৯ এবং আমার মনে হয় এটি একেবারেই নিস্প্রভ একটি সংখ্যা। তিনি উত্তরে বলেন, না এটি একটি অত্যন্ত মজার সংখ্যা। এটিই সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যাকে দুটি সংখ্যার ত্রিঘাত হিসেবে প্রকাশ করা যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম চতুর্থ ঘাতের অনুরূপ সমস্যার সমাধান তিনি বলতে পারেন কিনা। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন যে, কাছাকাছি কোনো উদাহরণ তার জানা নেই তবে তার মনে হয় যে, এ ধরনের সংখ্যাটি বড় হবে।' হার্ডি আরও বলেন, 'আমি তার কাছ থেকে যতোটুকু শিখেছি তিনি আমার কাছ থেকে ততোটুকু শেখেননি।' লিটলউড তার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'প্রত্যেকটি ধনাত্মক সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে তার বন্ধু ছিল।'

গসের সারা জীবনের সেরা ছাত্র ছিল জর্জ ফ্রেডারিক রিম্যান আর আইনস্টাইনের ভাষায় রিম্যান হলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্বোধ্য প্রতিভাবানদের একজন। আর গণিতের সবচেয়ে রহস্যময় মায়াবী এক উপপাদ্য হচ্ছে রিম্যান হাইপোথিসিস। গণিতবিদ হিলবার্ট বলেছিলেন তাকে যদি এক হাজার বছর ধরে ঘুমানোর পর জাগানো হয় তাহলে তার প্রথম প্রশ্ন হবে, 'রিম্যানীয় হাইপোথিসিসটি কি প্রমাণ করা হয়েছে?' সেই জেটা ফাংশনের কার্যকর সমাধান বের করেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত রামানুজন। তিনি মডুলার সমীকরণের সমাধান করতে পারতেন, অচিন্ত্যনীয় সূক্ষভাবে কমপ্লেক্স গুণন করতে পারতেন, চলমান যার জ্ঞান পৃথিবীর যে কোনো গণিতবিদদের চিন্তার বাইরে এবং সংখ্যাতত্ত্বের অসংখ্য বিখ্যাত সমস্যার সমাধান করেছেন। অথচ তিনি Double periodic function, Cauch's theorem এর নামও শুনেননি এবং কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের মতো সাধারণ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। তবু তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে ডাইভারজেন্স সিরিজের তত্ত্বের উপর একটি নতুন কাজ করেন।

১৯১৭ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাস্তবিকই সেই অসুখ হতে আর কখনই সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। ডাক্তাররা তাকে দেশে ফেরার পরামর্শ দেন। দেশে ফেরার পর তিনি বীরোচিত সম্মান পান। অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও তিনি গণিত নিয়ে পড়ে থাকতেন এবং হার্ডির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল মাত্র ৩৩ বছর বয়সে এ অসামান্য মেধাবী গণিতবিদের মহাপ্রয়ান ঘটে।

এতো অল্প বয়সে মারা গেলেও যেসব গাণিতিক উপপাদ্য ও সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তা বর্তমানে পদার্থ, রসায়ন, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কসমোলজি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। এতো অল্প বয়সে মারা না গেলে কী করতেন তা শুধুই কল্পনা করা যায়, কারণ তিনি কেবল শুরু করেছিলেন। রামানুজন ছিলেন সেই ধরনের প্রতিভা যার অস্তিত্ব কেবল বিজ্ঞান কল্পকাহিনীতেই পাওয়া যায়। তাকে যদি আপেক্ষিক তত্ত্ব, ব্ল্যাকহোল অথবা কসমোলজির অসমাধিত সমস্যা বা সমীকরণগুলো দিয়ে বসিয়ে দেয়া যেতো তাহলে তিনি কি করতেন? আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসুস্থ পরিবেশে কত প্রতিভার যে অকাল মৃত্যু ঘটে তা কে জানে?

Srinivasa Ramanujan, www.banglainternet.com